HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা
বর্ষ ১২ • সংখ্যা ১ • মার্চ ২০১৪
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৮
বাংলাদেশে ঢাকা শহরের ওষুধের দোকানে হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যবস্থাপনা

পৃষ্ঠা ১৫
২০০১ থেকে ২০১০ সালে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর অনুপাত একই রয়ে গেছে

পৃষ্ঠা ২০
সার্ভিলেন্স আপডেট

বাংলাদেশে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ

যক্ষ্মারোগের প্রভাব (রোগাক্রান্ত হওয়া, মৃত্যু এবং অর্থনৈতিক খরচ)-এর বিবেচনায় পৃথিবীতে বাংলাদেশ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে বক্ষব্যাধি হাসপাতালসমূহে প্রধানত যক্ষ্মারোগীদের ভর্তি করা হয় এবং ওইসব হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রতিদিন যক্ষ্মারোগীদের সংস্পর্শে আসার কারণে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। আমরা বাংলাদেশের বক্ষব্যাধি হাসপাতালে কর্মরত সেবাদানকারীদের দেহে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ নির্ণয়ে দুই ধাপে সম্পাদিত একটি টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট (টু-স্টেপ টিএসটি)-এ অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা চারটি বক্ষব্যাধি হাসপাতালে কর্মরত ৫০১ জন সেবাদানকারীকে আমন্ত্রণ জানাই। যাদের শরীরে যক্ষ্মারোগের দৃশ্যমান কোনো লক্ষণ নেই, তাদের দুই ধাপে টিএসটি পরীক্ষার পর যে-স্থানে টিএসটি প্রয়োগ করা হয়েছে সে-স্থানে ১০ মিলিমিটার বা তার বেশি ব্যাসবিশিষ্ট ত্বক যদি দৃঢ়/শক্ত (ইনডিউরেশন ডায়ামিটার) হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে যক্ষ্মারোগে সংক্রামিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কাই-স্কয়ার পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা সেবাদানকারীদের পেশাগত দলভিত্তিক এবং হাসপাতালভিত্তিক লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতার তুলনা করি। ৫০১ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে ৯০% (৪৪৯) পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের শরীরে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের সার্বিক ব্যাপকতা ছিলো ৫৪% এবং ল্যাবরেটরিকর্মীদের মধ্যে এ-রোগের ব্যাপকতা ছিলো সবচেয়ে বেশি (৬৫%)। অন্য তিনটি বক্ষব্যাধি হাসপাতালের

icddr,b

তুলনায় (পি ভ্যালু=০.০১) চট্টগ্রাম বক্ষব্যাধি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের দেহে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা ছিলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি (৬৭%)। যেসব দেশে যক্ষ্মারোগের স্বাস্থ্যগত প্রভাব খুব বেশি সেসব দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের দেহে লুক্কায়িত যক্ষ্মা সংক্রমণের ব্যাপকতা এবং এই গবেষণায় নির্ণীত লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা একই রকম। যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাদানে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ কমিয়ে আনার কৌশল নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে।

১৫ কোটি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যা-অধ্যুষিত বাংলাদেশ একটি নিম্নআয়ের দেশ এবং যক্ষ্মারোগের স্বাস্থ্যগত প্রভাবের বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ এবং বহু-ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মারোগের প্রভাবের দিক থেকে নবম স্থানে অবস্থানকারী (১)। ২০১২ সালে ১,৭০,০০০ জনেরও বেশি যক্ষ্মারোগী ছিলো বলে জানা যায়, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় যাদের ৬৩%-এর মধ্যে যক্ষ্মারোগ পাওয়া যায় (স্মেয়ার-পজিটিভ), অর্থাৎ চিকিৎসা প্রদানের পূর্বে এসব রোগী কর্তৃক অন্যদেরকে সংক্রামিত করার উচ্চ ক্ষমতা ছিলো। বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স সার্ভে ২০১০-২০১১-এর তথ্য অনুযায়ী, গবেষকগণ ১.৪% নতুন রোগী এবং পুনরায় চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে ২৯% বহু-ওষুধ-প্রতিরোধী রোগীর সন্ধান পান (২)। যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ভিন্ন একটি রূপ হলো লুক্কায়িত যক্ষ্মা। লুক্কায়িত যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে কোনো ধরনের লক্ষণ ও উপসর্গ থাকে না এবং এ'টি সংক্রামক নয়। যেসব ব্যাক্তির লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ রয়েছে তাদের জীবদ্দশায় যক্ষ্মারোগে লক্ষণ/উপসর্গ প্রকাশিত হওয়ার (অ্যাকটিভ যক্ষ্মা) আনুমানিক ঝুঁকি ১০% এবং সাধারণত সংক্রামিত হওয়ার দুই বছরের মধ্যে এ'টি ঘটে থাকে (৩)।

বক্ষব্যাধি হাসপাতালসমূহে প্রধানত যক্ষ্মারোগী ভর্তি করা হয় এবং ওইসব হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রতিদিন যক্ষ্মারোগীর (অ্যাকটিভ যক্ষ্মারোগীর) সংস্পর্শে আসার কারণে, বিশেষ করে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় যাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ সনাক্ত হয়েছে (স্মেয়ার-পজিটিভ) তাদের সংস্পর্শে আসার কারণে তারা সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছেন এবং হাসপাতালসমূহে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-থাকার কারণেও সেবাদানকারীগণ সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছেন (৪-৬)। যদিও নির্বাচিত কিছু নিম্ন- ও মধ্যআয়ের দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগের ব্যাপকতা ছিলো ৫৪% (ব্যাপ্তি ৩৩%-৭৯%) (৭), বাংলাদেশে স্বাস্থকর্মীদের মধ্যে এ-রোগের ব্যাপকতা-সংক্রান্ত তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা নির্ণয়ের জন্য এবং বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা বাস্তবায়নে ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনটিপি)-কে সহায়তা করার লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশের বক্ষব্যাধি হাসপাতালসমূহে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগের সংক্রমণের ব্যাপ্তি নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

আমরা চারটি বক্ষব্যাধি হাসপাতালে কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর সেবাদানকর্মীর মধ্যে একটি গবেষণা সম্পাদন করি। হাসপাতালগুলো হলো: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজিজেজ অব দ্যা চেস্ট অ্যান্ড হসপিটাল (এনআইডিসিএইচ), ঢাকা; বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, খুলনা; বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, রাজশাহী; এবং বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম। এই হাসপাতালগুলো বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য সর্ববৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং এসব হাসপাতাল থেকে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে।

আমরা চারটি হাসপাতালের সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাই, যাদের মধ্যে ছিলো ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট, প্রশাসক, এবং ল্যাবরেটরি ও সহায়ক কর্মী। গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীগণ লিখিতভাবে তাদের সম্মতি জানান। এই গবেষণা কার্যক্রমটি আইসিডিডিআর,বি-র

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। গবেষণায় অংশগ্রহণে সম্মতি পাওয়ার পর দুইজন প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট দুই ধাপে টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট (টিএসটি) সম্পাদন করেন। টেস্টটি হলো: মেনটোক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে আরটি২৩ পিউরিফাইড প্রোটিন ডেরাইভেটিভস্ (পিপিডি)-এর দুই ইউনিট টিউবারকুলিনের একটি ডোজ (০.১ এমএল) ত্বকের ভেতরে (ইন্ট্রাডারমাল) স্থাপন করা (৮)। প্রথম টিএসটি স্থাপনের ৪৮-৭২ ঘণ্টা পর মেডিকেল টেকনোলোজিস্টগণ ত্বকের যে-স্থানে ইনজেকশনের মাধ্যমে টিএসটি স্থাপন করা হয়েছিলো সেখানকার দৃঢ়/শক্ত হয়ে-যাওয়া (ইনডিউরেশন) ত্বকের ব্যাস আড়াআড়িভাবে পরিমাপ করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যাদের ত্বক দৃঢ়/শক্ত হয়ে-যাওয়া দৃশ্যমান ছিলো অথচ এর আকার ছিলো ১০ মিলিমিটারের কম, আমরা তাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা উত্তেজিত করা এবং এর প্রভাব সংগ্রহ করার জন্য তাদেরকে প্রথম টেস্টের ১৪ দিন পর দ্বিতীয় আরেকটি টিএসটি সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করি (৮)।

দুই ধাপে টিএসটি পরীক্ষা করার পর কারো ত্বকের ১০ মিলিমিটার বা তার বেশি ব্যাসবিশিষ্ট এলাকা যদি দৃঢ়/শক্ত হয়ে যায় তাহলে তাকে আমরা লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগী হিসেবে বিবেচনা করি, যদি না তার শরীরে যক্ষ্মারোগের দৃশ্যমান কোনো লক্ষণ থেকে থাকে। আমরা একটি সুবিন্যস্ত প্রশ্নমালার সাহায্যে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীগণ কত বছর ধরে স্বাস্থ্যসেবাদান-সংক্রান্ত পেশায় নিয়োজিত আছেন, তাদের পদবী, ব্যাসিল ক্যালমেট-গেরেন (বিসিজি) টিকা গ্রহণ-সংক্রান্ত তথ্য এবং বাড়িতে ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন কি না সে-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করি। আমরা কাই-স্কয়ার পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পেশাগত দল অনুযায়ী হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতার তুলনা করি।

২০১৩ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমরা গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য ৫০১ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে অনুরোধ করি। এদের মধ্যে ১৯ জন গবেষণায় অংশগ্রহণে এবং ৩৩ জন দ্বিতীয়বার টিএসটি পরীক্ষা করাতে অসম্মতি জানান। তাই গবেষণা কার্যক্রম থেকে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়। চারশত ঊনপঞ্চাশজন স্বাস্থ্যকর্মী দুই ধাপের টিএসটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এদের মধ্যে ৭৮ জন রাজশাহী, ৮১ জন খুলনা, ৬১ জন চট্টগ্রাম এবং ২২৯ জন ঢাকায় কাজ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক ছিলেন নার্স (৪৫%) এবং ৬১% ছিলেন মহিলা। বিরাশি শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে, শিশুকালে তারা বিসিজি টিকা নিয়েছেন। এসব উত্তরদাতাদের কারো মধ্যেই যক্ষ্মারোগ (অ্যাকটিভ যক্ষ্মারোগ) পাওয়া যায় নি।

সারণি: স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ধরনভিত্তিক বাংলাদেশের চারটি বক্ষব্যাধি হাসপাতালে দুই ধাপ-বিশিষ্ট টিউবারকুলিন স্কিন টেস্ট-এর মাধ্যমে নিশ্চিত লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা, ২০১৩ (মোট=৫০১)

জনমিতি এবং রোগের সংস্পর্শে আসা-সংক্রান্ত তথ্য	টিএসটি পরীক্ষায় নির্ণীত যক্ষ্মারোগীর হার	টিএসটি পরীক্ষায় নির্ণীত যক্ষ্মারোগী (সংখ্যা)	পি ভ্যালু
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান			
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, রাজশাহী	৫৫	৪৩	০.০১
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, খুলনা	৪০	৩২	
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	৬৭	৪১	
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজিজেজ অব দা চেস্ট অ্যান্ড হাসপাতাল, ঢাকা	৫৫	১২৬	

পরবর্তী পাতায় দেখুন ....

জনমিতি এবং রোগের সংস্পর্শে আসা-সংক্রান্ত তথ্য	টিএসটি পরীক্ষায় নির্ণীত যক্ষ্মারোগীর হার	টিএসটি পরীক্ষায় নির্ণীত যক্ষ্মারোগী (সংখ্যা)	পি ভ্যালু
লিঙ্গ			
পুরুষ	৫৩	১০০	০.৩৭
মহিলা	৫২	১৪২	
বিসিজি[১] টিকা গ্রহণ-সংক্রান্ত তথ্য			
হ্যাঁ	৫৫	১৯৮	০.৫৪
না	৪৯	৪০	
জানি না	৪৪	৪	
শিক্ষা			
০-প্রাথমিক স্তর	৫৩	২৬	০.৫৭
মাধ্যমিক স্তর	৪৯	৫৬	
উচ্চ মাধ্যমিক/ডিপ্লোমা	৫৪	১০৭	
স্নাতক[২]/স্নাতক সম্মান[৩]	৬০	৩৯	
স্নাতকোত্তর বা তদূর্ধ্ব	৫৬	১৪	
পেশাগত দল			
ডাক্তার	৫৬	১৫	০.৭৭
নার্স	৫২	১০৫	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৯	২৪	
ল্যাবরেটরি কর্মী	৬৫	১৩	
সহায়ক কর্মী	৫৩	৮৩	
ফার্মাসিস্ট	৩৩	২	
চাকুরির সময়কাল			
১০ বছর বা তার কম	৫০	৪৭	০.৫৮
১০-২০ বছরের কম	৫৮	৯২	
২০-৩০ বছরের কম	৫২	৬১	
৩০ বছর বা তার বেশি	৫২	৪২	
মধ্যমা, ইন্টারকোয়ার্টাইল রেট		১৯ (১১-২৭)	
বয়স			
১৮-৩০ বছরের কম	৫০	২৩	০.৭৭
৩০-৪০ বছরের কম	৫৪	৬৫	
৪০ বছর বা তার বেশি	৫৪	১৫৪	
মধ্যমা, ইন্টারকোয়ার্টাইল রেট		৪৩ (৩৬-৫০)	
ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে বাড়িতে বসবাস			
হ্যাঁ	১৫	৩৭	০.৪৫
না	৮৫	২০৫	

[১]ব্যাসিল ক্যালমেট-গেরেন; [২]তিন বছরের ডিগ্রি; [৩]চার বছরের ডিগ্রি

চারটি বক্ষব্যাধি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের সার্বিক হার ছিলো ৫৪%। চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের হার ছিলো সবচেয়ে বেশি (৬৭%) এবং খুলনায় এই হার ছিলো সর্বনিম্ন (৪০%) (পি ভ্যালু=০.০১) (সারণি)। পেশাভিত্তিক দলসমূহের মধ্যে সংক্রমণের ব্যাপকতার তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য ছিলো না (সারণি)। লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ৮৫% স্বাস্থ্যকর্মী জানান যে, আগে বাড়িতে তারা ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত কোনো রোগীর সংস্পর্শে আসেন নি।

প্রতিবেদক: ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনটিপি), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; সার্ভিলেন্স ও আউটব্রেক রেসপন্সেস রিসার্চ গ্রুপ, সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; ইউএসএআইডি; এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে শতকরা ৫৪ জনের দেহে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ ছিলো এবং চট্টগ্রাম বক্ষব্যাধি হাসপাতালে এই সংক্রমণের ব্যাপকতা ছিলো সবচেয়ে বেশি। সেবাদানকারীগণ বাড়িতে ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত কম রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন– এধরনের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, বক্ষব্যাধি হাসপাতালে প্রতিদিন যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আসার কারণে সম্ভবত সেবাদানকারীগণ এ-রোগে সংক্রামিত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ব্যাপকভাবে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মারোগ এবং সম্পূর্ণভাবে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মারোগের আবির্ভাবের কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্টপ টিবি পার্টনারসিপ (যক্ষ্মারোগ নির্মূলে নিয়োজিত ১,০০০-এর বেশি আন্তর্জাতিক সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা) সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে (৯,১০)।

যক্ষ্মারোগের প্রভাব (রোগাক্রান্ত হওয়া, মৃত্যু এবং অর্থনৈতিক খরচ) খুব বেশি এমন দেশসমূহের স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর জোশি ও অন্যান্য বিজ্ঞানী কর্তৃক সম্পাদিত একটি ধারাবাহিক পর্যালোচনার ফলাফলের সাথে আমাদের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত নিবন্ধে গবেষকগণ নিম্নআয়ের অন্যান্য দেশসমূহ, যেখানে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা খুব বেশি, সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত সংক্রমণের ব্যাপকতা একই রকম (৫৪%) বলে জানিয়েছেন (৭)। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় সনাক্তকৃত যক্ষ্মারোগীর ব্যাপকতা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত আচার-আচরণ, স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মস্থলের অবস্থান এবং হাসপাতালে রোগী ভর্তি হওয়ার হারের ভিন্নতাজনিত কারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী চারটি হাসপাতালে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

পেশাগত কারণে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত-হওয়া ব্যক্তিদের ওপর সম্পাদিত সকল গবেষণার মতো আমাদের গবেষণায়ও লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা প্রকৃত ব্যাপকতার চেয়ে বেশি হিসাব করা হয়ে থাকতে পারে কারণ আমরা স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক বাড়িতে অথবা তাদের বসবাসের এলাকায় আক্রান্ত যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আসা-সংক্রান্ত তথ্য আমাদের এই গবেষণা থেকে বাদ দিতে পারি নি। তবে, শুধুমাত্র ১৫% স্বাস্থ্যকর্মী (যাদের টিএসটি পরীক্ষায় যক্ষ্মারোগ নিশ্চিত হয়েছে) জানিয়েছেন যে, বাড়িতে তারা যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। টিএসটি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর সম্ভবত বিসিজি টিকার একটি প্রভাব ছিলো। তবে, যক্ষ্মারোগের উচ্চ প্রভাব রয়েছে এমন দেশসমূহে পরিচালিত বহু টিএসটি-সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিসিজি টিকাদান টিএসটি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণীত শিশু এবং বয়স্কদের বাৎসরিক সংক্রমণের ঝুঁকির হিসাবকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে নি (১১-

১৩)। এছাড়াও, টিএসটি পরীক্ষা *মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস* ও নন-টিউবারকুলাস মাইকোব্যাক্টেরিয়ার কারণে সংঘটিত সংক্রমণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। তাই এই গবেষণায় লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের সঠিক ব্যাপকতার চাইতে অধিক হিসাব করা হয়ে থাকতে পারে। যদিও ইন্টারফেরোন-গামা রিলিজ অ্যাসে (আইজিআরএ) পদ্ধতিতে সম্পাদিত পরীক্ষার ফলাফল অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং নন-টিউবারকুলাস মাইকোব্যাক্টেরিয়ার কারণে এটি প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম (১৪), তবুও ধারাবাহিক পরীক্ষার জন্য সঠিক কাট-অফ মানের অভাব এবং কাট-অফ মানের নিকটবর্তী ইন্টারফেরোন-গামা মানের তারতম্যের কারণে ধারাবাহিক আইজিআরএ পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে কনভার্সান এবং রিভার্সন-বিষয়ক ভুল তথ্য পাওয়া যেতে পারে (১৫)। বহু গবেষণায় টিএসটি এবং আইজিআরএ পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে উচ্চমাত্রায় সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে এবং দু'টি পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রণীত ব্যাপকতার হিসাব একটির সাথে অপরটি তুলনীয় ছিলো (১৬,১৭)।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, সেবাদানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ সংক্রমণ এখনো চলমান রয়েছে, যা যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক উন্নততর নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের মধ্যে যে-বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা হলো: নতুন রোগী সনাক্ত করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে লুক্কায়িত যক্ষ্মারোগ সংক্রমণ নির্ণয়ে প্রত্যাশিত ধারাবাহিক টিএসটি পরীক্ষা করা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ণয়ে স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সংক্রমণে দায়ী ঝুঁকির কারণসমূহ খুঁজে বের-করা (১৮)। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করেছে। তবে, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব নির্দেশিকা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করছে কি না তা যাচাই করা প্রয়োজন (১৯)। বাংলাদেশের হাসপাতালসমূহে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং সুযোগসমূহ চিহ্নিত করার জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং স্বাস্থকর্মীদের আচার-আচরণের ওপর ভবিষ্যতে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এই গবেষণার ফলাফলসমূহ আরো কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে সেবাদান-সংশ্লিষ্ট যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জাতীয় যক্ষ্মারোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সহায়তা করবে।

References

1. World Health Organization. Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing: WHO report 2009. Geneva: World Health Organization, 2009. 78 p.
2. World Health Organization, Regional Office for South-East Asia/Country Office for Bangladesh and Ministry of Health and Family Welfare. First Bangladesh National Tuberculosis Drug Resistance Survey 2010-2011. Dhaka: Country Office for Bangladesh, World Health Organization. 2013. 90 p.
3. Centre for Disease Control and Prevention. Guidelines for Preventing the Transmission of *Mycobacterium* tuberculosis in Health-Care Facilities, 1994. *MMWR Recomm Rep*1994;43(RR-13):4.
4. Menzies D, Joshi R, Pai M. Risk of tuberculosis infection and disease

associated with work in health care settings. *Int J Tuberc Lung Dis* 2007;11:593-605.

5. Demkow U, Broniarek-Samson B, Filewska M, Lewandowska K, Maciejewski J, Zycinska K *et al*. Prevalence of latent tuberculosis infection in health care workers in Poland assessed by interferon-gamma whole blood and tuberculin skin tests. *J Physiol Pharmacol* 2008;59:209-17.
6. Alonso-Echanove J, Granich RM, Laszlo A, Chu G, Borja N, Blas R *et al*. Occupational transmission of Mycobacterium tuberculosis to health care workers in a university hospital in Lima, Peru. *Clin Infect Dis* 2001;33:589-96.
7. Joshi R, Reingold AL, Menzies D, Pai M. Tuberculosis among health-care workers in low- and middle-income countries: a systematic review. *PLoS medicine* 2006 Dec;3(12):e494.
8. Nayak S, Acharjya B. Mantoux test and its interpretation. *Indian Dermatol Online J*. 2012 Jan;3(1):2-6.
9. Raviglione M. XDR-TB: entering the post-antibiotic era? *Int J Tuberc Lung Dis* 2006;10:1185-7.
10. Klopper M, Warren RM, Hayes C, Gey van Pittius NC, Streicher EM, Muller B, *et al*. Emergence and spread of extensively and totally drug-resistant tuberculosis, South Africa. *Emerg Infect Dis* 2013;19(3):449-55.
11. Chadha VK, Jaganath PS, Kumar P. Tuberculin sensitivity among children vaccinated with BCG under universal immunization programme. *Indian J Pediatr* 2004;71:1063-8.
12. Chadha VK, Jagannatha PS, Kumar P. Can BCG-vaccinated children be included in tuberculin surveys to estimate the annual risk of tuberculous infection in India? *Int J Tuberc Lung Dis* 2004;8:1437-42.
13. Dagnew AF, Hussein J, Abebe M, Zewdie M, Mihret A, Bedru A *et al*. Diagnosis of latent tuberculosis infection in healthy young adults in a country with high tuberculosis burden and BCG vaccination at birth. *BMC Res Notes* 2012;5:415.
14. Pai M, Riley LW, Colford JM, Jr. Interferon-gamma assays in the immunodiagnosis of tuberculosis: a systematic review. *Lancet Infect Dis* 2004;4:761-76.
15. Zwerling A, van den Hof S, Scholten J, Cobelens F, Menzies D, Pai M. Interferon-gamma release assays for tuberculosis screening of healthcare workers: a systematic review. *Thorax* 2012 ;67(1):62-70.
16. Pai M, Gokhale K, Joshi R, Dogra S, Kalantri S, Mendiratta DK *et al*. Mycobacterium tuberculosis infection in health care workers in rural India: comparison of a whole-blood interferon gamma assay with tuberculin skin testing. *JAMA* 2005;293:2746-55.
17. Bianchi L, Galli L, Moriondo M, Veneruso G, Becciolini L, Azzari C *et al*. Interferon-gamma release assay improves the diagnosis of tuberculosis in children. *Pediatr Infect Dis J* 2009;28:510-4.

18. Ogunremi T, Menzies D, Embil J. Prevention and Control of Tuberculosis: Transmission in Health Care and other settings. *In*: Canadian Tuberculosis Standards, 7th Ed. Ottawa: Public Health Agency of Canada. 2013.
19. National Tuberculosis Control Programme. Bangladesh National Guidelines for Tuberculosis Infection Control. Dhaka: National Tuberculosis Control Programme, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of Peoples Republic of Bangladesh. 2011.

বাংলাদেশে ঢাকা শহরের ওষুধের দোকানে হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ওষুধ বিক্রেতাগণ প্রায়ই দরিদ্র এবং স্বল্পশিক্ষিত জনগণের সেবাপ্রাপ্তির প্রথম অবলম্বন হিসেবে কাজ করে থাকেন। ঢাকা শহরের ওষুধ বিক্রেতাদের দ্বারা হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে (এআরআই) আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য আমরা দৈবচয়নের মাধ্যমে ১০০টি ওষুধের দোকানে (ফার্মেসি) একটি ক্রস-সেকশনাল গবেষণা পরিচালনা করি। ওষুধ বিক্রেতাগণ কীভাবে ওষুধ দিয়ে থাকেন তা মূল্যায়নের জন্য আমরা কিছু মাঠ-সহকারী নিয়োগ করি যারা বিভিন্ন ধরনের এআরআই রোগীর আত্মীয় সেজে ওষুধ বিক্রেতাদের কাছে যান। এতে দেখা যায়, ওষুধ বিক্রেতাগণ ৭৬% (৪৫৬/৬০০) রোগীদেরকে ওষুধ দিয়েছেন। শতকরা সাঁইত্রিশ ভাগ (২২৪/৬০০) রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন এবং ৩৯% (২৩২/৬০০) রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ওষুধ দিয়েছেন। কিছু রোগী যাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় নি তাদের রোগ যদি ৩-৫ দিনের মধ্যে সেরে না-যায় তাহলে তাদেরকে পুনরায় এসে অ্যান্টিবায়োটিক নিতে বলা হয়েছে (৩০%; ৬৯/২৩২) এবং অন্যদেরকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক নিতে বলা হয়েছে (৮%; ১৯/২৩২)। শুধুমাত্র ৬% (৩৩/৬০০) ক্ষেত্রে ওষুধ বিক্রেতাগণ রোগীর জন্য ওষুধ প্রদানে অসম্মতি জানান কারণ রোগী ফার্মেসিতে উপস্থিত ছিলো না। ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস-শীর্ষক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী ইউনিসেফ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত এআরআই ব্যবস্থাপনাবিষয়ক নির্দেশাবলির ভিত্তিতে শুধুমাত্র নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরকেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃক রোগীর অবস্থা মূল্যায়নের পর মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদেরকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পাঠানো উচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওষুধ বিক্রেতাগণ এআরআই গাইডলাইন অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করেন নি। প্রায়োগিক এআরআই ব্যবস্থাপনার ওপর আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ওষুধের নিরাপদ বিতরণ নিশ্চিত করতে পারে।

স্বল্পোন্নত দেশে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পরামর্শ এবং ওষুধ প্রদানের ক্ষেত্রে ফার্মেসিসমূহে ওষুধ বিক্রেতাগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন (১,২)। ২০০৯ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় ঢাকায় পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৪৮% উত্তরদাতা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার কারণে সেবা গ্রহণের প্রথম অবলম্বন হিসেবে ফার্মেসি ব্যবহার করেছিলেন (৩)।

আমরা ওষুধ বিক্রেতাদের দ্বারা হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে (এআরআই) আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য পুরো ঢাকা শহরে একটি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করি। ২০১২ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ১০০টি ফার্মেসির ওপর আমরা একটি

ক্রস-সেকশনাল গবেষণা পরিচালনা করি। আমরা ঢাকা শহরের ১০টি অঞ্চলের প্রতিটি থেকে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম ব্যবহার করে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১০টি (জিপিএস) পয়েন্ট নির্বাচন করি এবং নির্বাচিত প্রতিটি জিপিএস পয়েন্টের নিকটবর্তী ফার্মেসি চিহ্নিত করার মাধ্যমে এগুলোকে গবেষণার জন্য তালিকাভুক্ত করি (চিএ)। ওষুধ বিক্রেতাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সময় ফার্মেসিতে থাকেন তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য লিখিত সম্মতি নেওয়ার পর তাদের জনমিতি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা একটি সুবিন্যস্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করি। এছাড়া, ছয়জন মাঠ-সহকারী এআরআই আক্রান্ত রোগীর আত্মীয় সেজে নির্বাচিত ফার্মেসিসমূহে যান এবং ওষুধ বিক্রেতাদের কাছে উক্ত এআরআই রোগীদের চিকিৎসা সম্পর্কে তাদের পরামর্শ চান। চিকিৎসার লক্ষ্যে ওষুধ প্রদানের জন্য মাঠ-সহকারীগণ কোনো ব্যবস্থাপত্র তাদের দেখান নি। ছয়জন মাঠ-সহকারীর প্রত্যেককে তাদের জন্য নির্ধারিত ফার্মেসিতে গিয়ে উপস্থাপনের জন্য ছয়টি (তিনটি শিশু এবং তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর) ভিন্ন ধরনের রোগের তথ্য থেকে একটিমাত্র তথ্য দেওয়া হয়েছিলো। রোগের বিবরণসমূহ ছিলো: শিশুর তীব্র কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা; শিশুর কাশি এবং জ্বর; শিশুর শ্বাসকষ্ট; প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা; প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর কাশি এবং জ্বর; এবং প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট। ওষুধ বিক্রেতাগণ অসুস্থতার স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে জানতে চাইলে মাঠ-সহকারীগণ জানিয়েছেন যে, কাশি ছিলো সাতদিন ধরে (ভাইরাসজনিত শ্বাসতন্ত্রে অসুস্থতার সাধারণ স্থায়িত্বকাল), তিনদিন ধরে জ্বর এবং একদিন শ্বাসকষ্ট ছিলো। প্রথমবার ওষুধ বিক্রেতাগণ ওষুধ দিতে রাজি না-হলে মাঠ-সহকারীগণ দ্বিতীয়বার তাদের কাছে ওষুধ চান এই বলে যে, অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন না এবং বিভিন্ন অসুবিধার কারণে রোগীকেও ফার্মেসিতে আনা যাচ্ছে না। মাঠ-সহকারীগণ রোগীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ওষুধ চান নি। ওষুধ বিক্রেতাগণ যখন ওষুধ দিতে সম্মত হয়েছেন তখন মাঠ-সহকারীগণ তা কিনে নিয়েছেন এবং তাদের প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ লিখে নিয়েছেন।

চিত্র: বাংলাদেশের ঢাকা শহরের ১০টি অঞ্চল থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত ১০০টি ফার্মেসির অবস্থান, ২০১২

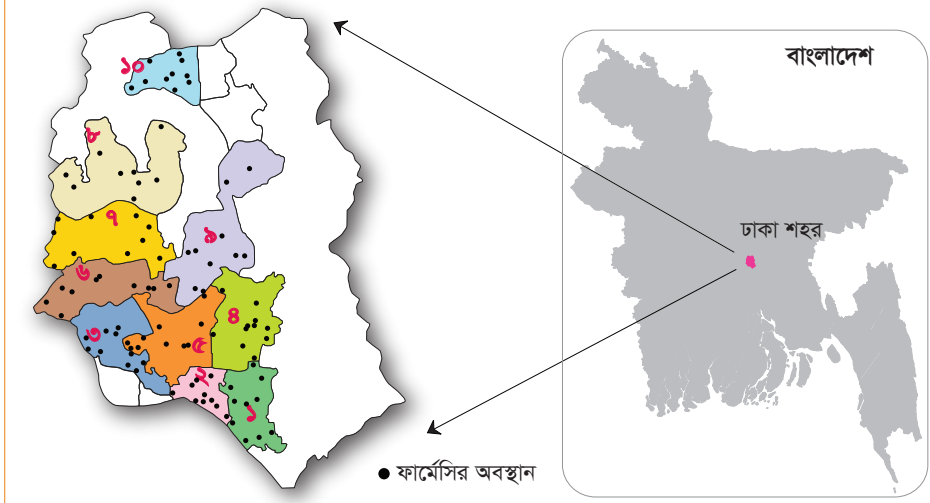

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১০০টি ফার্মেসির মধ্যে ৬৭% ছিলো সরকারি লাইসেন্সধারী এবং বাকিগুলোর কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিলো না। সাক্ষাতকার প্রদানকারী ওষুধ বিক্রেতাগণের মধ্যমা বয়স ছিলো ৩৪ বছর (ইন্টারকোয়ার্টাইল রেঞ্জ [আইকিউআর]: ২৮-৪১), শিক্ষা সম্পন্ন করার মধ্যমা সময় ছিলো ১২ বছর (আইকিউআর: ১০-১৪) এবং কাজের অভিজ্ঞতার মধ্যমা সময়কাল ছিলো ১২ বছর (আইকিউআর: ৭-১৪)। শতকরা আটান্ন ভাগ ফার্মেসিতে একজন করে ওষুধ বিক্রেতা ছিলো, সাক্ষাতকার প্রদানকারী ৪৮% ওষুধ বিক্রেতা স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত অনুমোদিত প্রফেশনাল সার্টিফিকেট কোর্স করেছিলেন এবং ৮% একের অধিক কোর্স সম্পন্ন করেছিলেন।

সর্বমোট ৬০০টি পরামর্শের মধ্যে ওষুধ বিক্রেতাগণ ৩৮৩টি (৬৪%) ক্ষেত্রে প্রথম অনুরোধে ওষুধ দিয়েছেন, ১৮৪টি (৩১%) ক্ষেত্রে মাঠ-সহকারীগণকে রোগী নিয়ে চিকিৎসকের কাছে বা কোনো হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ৩৩টি (৬%) ক্ষেত্রে রোগীর অনুপস্থিতির কারণে ওষুধ সরবরাহ করতে অসম্মতি জানিয়েছেন (সারণি ১)। প্রথমবার ওষুধ প্রদানে অসম্মতি জানানো সত্ত্বেও পরবর্তীতে ৭৩টি (১২%) ক্ষেত্রে ওষুধ বিক্রেতাগণ রোগী ছাড়া ওষুধ দিতে সম্মত হয়েছেন (সারণি ১)।

সারণি ১: ২০১২ সালের জুন-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের ঢাকা শহরের ১০০টি নির্বাচিত ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতা কর্তৃক হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান

ওষুধ বিক্রেতা কর্তৃক সাড়া প্রদান	রোগের বিবরণ					
	এআরআই আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগী			এআরআই আক্রান্ত শিশু রোগী		
	কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা সংখ্যা=১০০ %	কাশিসহ জ্বর সংখ্যা=১০০ %	জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট সংখ্যা=১০০ %	কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা সংখ্যা=১০০ %	কাশিসহ জ্বর সংখ্যা=১০০ %	শ্বাসকষ্ট সংখ্যা=১০০ %
১ম অনুরোধে এক বা একাধিক ওষুধ প্রদান	৯৮	৭০	৪৯	৬৩	৭৬	২৭
১ম অনুরোধে ওষুধ প্রদানে অসম্মতি এবং চিকিৎসকের শ্মরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ প্রদান	১	২৯	৩৮	৩২	১৪	৭০
রোগী অনুপস্থিত থাকায় ১ম অনুরোধে ওষুধ প্রদানে অসম্মতি	১	১	১৩	৫	১০	৩
২য় অনুরোধের পর এক বা একাধিক ওষুধ প্রদান	০	২৭	১০	১৫	৩	১৮
পরামর্শের সময় এক বা একাধিক ওষুধ প্রদান	৯৮	৯৭	৫৯	৭৮	৭৯	৪৫

যে ওষুধটি সবচেয়ে বেশিবার দেওয়া হয়েছিলো সেটি হলো এসিটামিনোফেন এবং এটি দেওয়া হয়েছে মোট ৬০০টি পরামর্শের মধ্যে ২৩৮টি (৪০%) ক্ষেত্রে; অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে মোট ২২৪টি (৩৭%) পরামর্শের সময় (শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের মধ্যে যাদের শুধুমাত্র কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা ছিলো তাদের সহ); অ্যান্টিহিস্টামিন দেওয়া হয়েছে ১১৭টি (২৯%) পরামর্শের ক্ষেত্রে (যেসব রোগীর ক্ষেত্রে কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরার কথা জানানো হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই এই ওষুধ দেওয়া হয়েছে); এবং ১০৩টি (১৭%) ক্ষেত্রে ব্রঙ্কোডাইলেটর দেওয়া হয়েছে (প্রধানত যেসব রোগী শ্বাসকষ্ট ছিলো তাদের ক্ষেত্রে) (সারণি ২)। গড়ে প্রতিটি পরামর্শে ২.১টি (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ±০.৯৫) ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ঊনানব্বইটি (১৫%) পরামর্শের ক্ষেত্রে তিন বা ততোধিক ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ২: ২০১২ সালের জুন-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের ঢাকা শহরের ১০০টি নির্বাচিত ফার্মেসির ওষুধ বিক্রেতা কর্তৃক হঠাৎ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রদত্ত ওষুধ

ওষুধ প্রদান	রোগের বিবরণ					
	এআরআই আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগী			এআরআই আক্রান্ত শিশু রোগী		
	কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা সংখ্যা=১০০ %	কাশিসহ জ্বর সংখ্যা=১০০ %	জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট সংখ্যা=১০০ %	কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরা সংখ্যা=১০০ %	কাশিসহ জ্বর সংখ্যা=১০০ %	শ্বাসকষ্ট সংখ্যা=১০০ %
এসিটামিনোফেন	১০	৯৪	৫২	৩	৭৯	০
এন্টিহিস্টামিন	৭৪	২৫	১০	৪৪	২৩	১
ব্রঙ্কোডাইলেটর	০	৪	৩৬	৮	৮	৪৭
স্ট্যারয়েড	১	১	৬	০	০	৪
অ্যান্টিবায়োটিক (১ম অনুরোধে)	৪৩	৪৬	৪০	২৫	৪১	৮
অ্যান্টিবায়োটিক (২য় অনুরোধে)	০	৯	৫	১	০	৬
অ্যান্টিবায়োটিক (সর্বমোট)	৪৩	৫৫	৪৫	২৬	৪১	১৪
অন্য ধরনের ওষুধ	৫৫	৫৬	২৪	৩০	২০	১০
অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া অন্য ওষুধ	৫৫	৪২	১৪	৫২	৩৮	৩১
তিন বা ততোধিক ওষুধ	১৭	৩০	২৩	১	১৬	২

রোগের সবগুলো অবস্থার জন্য প্রদত্ত অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে অ্যামোক্সিসিলিন সবচেয়ে বেশিবার দেওয়া হয়েছে—যা ৬০০টি পরামর্শের মধ্যে ৮৬টি (১৪%) ক্ষেত্রে অ্যামোক্সিসিলিন দেওয়া হয়েছে এবং এজিথ্রোমাইসিন দেওয়া হয়েছে ৬৬টি (১১%) ক্ষেত্রে। ৬০০টি পরামর্শের মধ্যে ২৭টি (৫%) ক্ষেত্রে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দেওয়া হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি কাশি এবং জ্বরে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের জন্য দেওয়া হয়েছে।

ওষুধ বিক্রেতাগণ ৪৫৬টি পরামর্শের সময় যেসব রোগীকে ওষুধ দিয়েছেন তাদের মধ্যে ১৪২টি (৩১%) ক্ষেত্রে উপদেশও দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি যে উপদেশটি দিয়েছেন তাহলো: যদি তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে রোগী ভালো না-হয় তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য পুনরায় ফার্মেসিতে যাওয়া (৬৯টি পরামর্শ; ৪৯%), ঠাণ্ডা পানীয় পরিহার করা (২২টি পরামর্শ; ১৬%), যদি রোগ ভালো না-হয় তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে কি না তা জানার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া (১৯টি পরামর্শ; ১৩%) এবং নেবুলাইজার ব্যবহার করা (১৩টি পরামর্শ; ৯%—শুধুমাত্র শ্বাসকষ্টে-ভোগা শিশু রোগীদের নেবুলাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে)।

প্রতিবেদক: রেসপিরেটরি ভাইরাসেস রিসার্চ গ্রুপ, সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: ইনফ্লুয়েঞ্জা ডিভিশন, সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র; রোগতত্ত্ব রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্তব্য

বাংলাদেশে ২০০৭ সালে পরিচালিত একটি জাতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৯৫% স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী নিয়ন্ত্রণহীন, অসংগঠিত এবং যে-বিষয় নিয়ে তারা কাজ করেন তাদের মধ্যে সে-সংক্রান্ত যোগ্যতার অভাব রয়েছে (৪)। এই সমীক্ষায় বাংলাদেশের মোট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ওষুধ বিক্রেতাগণ ছিলেন ৮% এবং শহরে এই হার ছিলো ১৬% (৪)। এ থেকে আরো জানা যায় যে, কোনো ওষুধ বিক্রেতারই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বা ওষুধ বিক্রির ওপর ন্যূনতম প্রশিক্ষণও ছিলো না (৪)। আমাদের গবেষণায় ৪৮% ওষুধ বিক্রেতা জানান যে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান-সংক্রান্ত কমপক্ষে একটি পেশাগত প্রশিক্ষণে তারা অংশগ্রহণ করেছেন।

এআরআই-আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগীই সাধারণত কাশি, নাক দিয়ে পানি-ঝরা, এবং জ্বরসহ অথবা জ্বরবিহীন গলাব্যাথায় ভুগে থাকে (৫)। অসুস্থতার এসব লক্ষণ যাদের মধ্যে দেখা যায় সাধারণত তারা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ছাড়াই আপনা-আপনি ভালো হয়ে যায় (৫)।

ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস (আইএমসিআই) শীর্ষক চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুযায়ী ইউনিসেফ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এআরই রোগ ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা (গাইডলাইন) প্রণয়ন করেছে, যেখানে সাধারণ ঠাণ্ডা এবং জ্বরের (কাশি এবং নাক বন্ধ/নাক দিয়ে পানি-ঝরা) রোগীদের চিকিৎসায় কাশি উপশমের জন্য বাড়িতে বসেই নেওয়া যায় এমন ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের পাশাপাশি একমাত্র ওষুধ হিসেবে এসিটামিনোফেন বিবেচনা করা হয়েছে এবং রোগীর যদি বিপজ্জনক কোনো লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে পুনরায় স্বাস্থসেবা প্রদানকারীদের নিকট যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (৬)। এই গাইডলাইন অনুযায়ী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হিসেবে নির্ণীত রোগীদেরকে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত এবং মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হিসেবে কাউকে সন্দেহ হলে তাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কর্তৃক রোগ নির্ণয়ের পর কোনো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রেফার করা উচিত (৬)। তবে, আমাদের গবেষণায় রোগী রেফার করার ক্ষেত্রে অসংগতি এবং রোগীর অবস্থা মূল্যায়ন ছাড়াই সচরাচর অ্যান্টিবায়োটিক দিতে দেখা গেছে। সাধারণ থেকে মারাত্মক এআরআই-আক্রান্ত শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয় শ্রেণীর

রোগীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক সচরাচর দিতে দেখা গেছে। বাংলাদেশে ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় ওষুধ নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রেতা কর্তৃক কোনো রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া নিষেধ (৭)। তবে, আমাদের গবেষণায় শুধুমাত্র কাশি এবং নাক দিয়ে পানি-ঝরার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৪০%-এর বেশি পরামর্শে এবং শিশুদের জন্য এক-চতুর্থাংশ পরামর্শে ওষুধ বিক্রেতা কর্তৃক অ্যান্টিবায়োটিক দিতে দেখা গেছে। এছাড়া, কাশি এবং জ্বর রয়েছে এমন প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয় শ্রেণীর রোগীদের ক্ষেত্রে মোট পরামর্শের প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে। গবেষণার এই ফলাফল থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, অ্যান্টিবায়োটিকের অপপ্রয়োগের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওষুধ বিক্রেতাগণের জ্ঞানের অভাব ছিলো এবং সম্ভবত তারা এটা করেছিলো কিছুটা আর্থিক দিক বিবেচনা করে। অন্যান্য দেশে পরিচালিত কতিপয় গবেষণায় এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিচালিত একটি গবেষণায়ও এআরআই-আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে জানা গেছে (৮-১২)। অ্যান্টিবায়োটিকের অপপ্রয়োগ, বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশে, বিশ্বব্যাপী ওষুধ প্রতিরোধী অসুস্থতা (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়্যাল রেজিস্টেন্স) ছড়িয়ে দিতে অবদান রাখতে পারে।

আমাদের গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। প্রথমত, যেসব ওষুধ বিক্রেতা আমাদের গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি জানিয়েছেন তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা আমরা মূল্যায়ন করতে পারি নি এবং হতে পারে তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ওষুধ বিক্রেতাদের থেকে আলাদা। দ্বিতীয়ত, এই গবেষণায় এআরআই-এর ছয়টি পূর্ব-নির্ধারিত রোগের অবস্থার ওপর সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে, এআরআই-এর সম্ভাব্য সকল ধরনের রোগের প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তৃতীয়ত, মাঠকর্মীদের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যারা কাল্পনিক রোগীদের রোগের অবস্থা ওষুধ বিক্রেতাদের নিকট উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং সত্যিকার রোগী সম্পর্কে ওষুধ বিক্রেতা এবং তাদের ক্রেতাদের মধ্যকার আলাপচারিতার বিভিন্ন বিষয় আমরা জানতে পারি নি অথবা যাদেরকে ওষুধ না-দিয়ে ফেরত দেওয়া হয়েছিলো তারা সত্যিকার অর্থে কী সিদ্ধান্ত নিতেন সে-সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি নি। চতুর্থত, এই গবেষণা যেহেতু ঢাকা শহরে পরিচালিত হয়েছে, এর ফলাফল বাংলাদেশের সকল অঞ্চল, এমনকি বাংলাদেশের অন্য কোনো শহরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

এই গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে আমরা সুপারিশ করছি যে, বাংলাদেশ সরকারের ওষুধ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ মিলে ওষুধ বিক্রেতাদের আইএমসিআই এবং জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী এআরআই ব্যবস্থাপনার ওপর প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত, যা সেবার মান উন্নত করতে পারে এবং ওষুধের অপপ্রয়োগও কমাতে পারে। এছাড়া, নীতিনির্ধারকগণ যদি ফার্মেসি থেকে অ্যান্টিবায়োটিক প্রদানের ওপর একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেন এবং তা মেনে চলার জন্য বিধিমালা তৈরি করেন, তাহলে তা খুবই ফলদায়ক হবে।

References

1. Goel P, Ross-Degnan D, Berman P, Soumerai S. Retail pharmacies in developing countries: a behavior and intervention framework. *Soc Sci Med* 1996;42:1155-61.
2. Smith F. The quality of private pharmacy services in low and middle-income countries: a systematic review. *Pharm World Sci* 2009;31:351-61.
3. icddr,b. The economic burden of influenza-like illness in Mirpur, Dhaka,

during the 2009 pandemic: A household cost of illness study. *Health Sci Bul* 2010;8(1):12-8.

4. Ahmed SM, Hossain MA, Chowdhury MR. Informal sector providers in Bangladesh: how equipped are they to provide rational health care? *Health Policy Plan* 2009;24:467-78.
5. World Health Organization. Cough and cold remedies for the treatment of acute respiratory infections in young children. Geneva: Department of Child and Adolescent Health and Development. World Health Organization. 2001. 39 p.
6. World Health Organization. Handbook IMCI: Integrated management of childhood illness. Geneva: Department of Child and Adolescent Health, World Health Organization. 2005. 173 p.
7. Government of Bangladesh. The National Drug Policy 2005. Dhaka: Ministry of Health and Family Welfare, Government of People's Republic of Bangladesh. 2005.
8. Chuc NTK, Larsson M, Falkenberg T, Do NT, Binh NT, Tomson GB. Management of childhood acute respiratory infections at private pharmacies in Vietnam. *Ann Pharmacother* 2001;35:1283-8.
9. Tumwikirize WA, Ekwaru PJ, Mohammed K, Ogwal-Okeng JW, Aupont O. Management of acute respiratory infections in drug shops and private pharmacies in Uganda: a study of counter attendants' knowledge and reported behaviour. *East Afr Med J* 2004;Suppl: p. S33-40.
10. Bhuiya A. Health for the rural masses: Insights from Chakaria. Dhaka: International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. 2009. 125 p.
11. Dameh, M. JG, Norris P. Over-the-counter sales of antibiotics from community pharmacies in Abu Dhabi. *Pharm World Sci* 2010;32:643-50.
12. Kagashe GA, Minzi O, Matowe L. An assessment of dispensing practices in private pharmacies in Dar-es-Salaam, Tanzania. *Int J Pharm Pract* 2011;19:30-5.

২০০১-২০১০ সালে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর অনুপাত একই রকম রয়ে গেছে

হেপাটাইসিট ই ভাইরাস (এইচইভি) যকৃতের একটি মারাত্মক সংক্রমণ যার কারণে অন্যদের তুলনায় গর্ভবর্তী মহিলারা বেশি মারা যায়। বাংলাদেশে প্রায়ই মাতৃমৃত্যুর সাথে জন্ডিসের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় এবং সম্ভবত এইচইভি এসব মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ। আমরা ২০১০ সালে সম্পাদিত মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা সমীক্ষার জনসংখ্যাভিত্তিক ভারবাল অটপসি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই যে, বাংলাদেশের মোট মাতৃমৃত্যুর মধ্যে ২৩% মারা যাওয়ার আগে মারাত্মক জন্ডিসে আক্রান্ত ছিলো। অতীতে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সাথে এই ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে বাংলাদেশে ১৯% মাতৃমৃত্যু জন্ডিসজনিত করণে ঘটেছিলো। এইচইভি-র কারণে মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যুর প্রকোপ আরো সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং গর্ভবতী মহিলা ও তাদের নবজাতকদের মৃত্যুরোধে এইচইভি টিকার সম্ভাব্য ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে এইচইভি-র ধারাবাহিক সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

হেপাটাইসিট ই ভাইরাস (এইচইভি) একটি সিঙ্গেল-স্ট্রেন্ডেড, পজিটিভ-সেন্স আরএনএ ভাইরাস যা প্রধানত মল-থেকে-খাবারের মাধ্যমে মানব দেহে সংক্রামিত হয় এবং এর ফলে হেপাটাইটিস রোগের মহামারি ও বিচ্ছিন্নভাবে সংক্রমণ ঘটে থাকে (১)। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় এইচইভি একটি আঞ্চলিক রোগ (২,৩)। পুরুষ এবং গর্ভবতী নন এমন মহিলাদের মধ্যে এই সংক্রমণটি সাধারণত স্ব-নিয়ন্ত্রিত ছিলো এবং এর ফলে মৃত্যুর হার ০.১%-এরও কম ছিলো (৪)। তবে, যেসব মহিলা তাদের গর্ভকালীণ সময়ের তৃতীয় ট্রাইমেস্টার (ত্রৈমাসিক)-এ সংক্রামিত হন তাদের মৃত্যুর হার ২০%-এ পৌঁছুতে পারে (৫)। এইচইভি সংক্রমণের কারণে গর্ভবতী মহিলাদের যকৃত দ্রুত অকার্যকর হয়ে যায় এবং রক্তক্ষরণের ফলে এইচইভি রোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু ঘটে (৬)। হাসপাতালভিত্তিক অল্পসংখ্যক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, মায়ের শরীর থেকে গর্ভস্থ ভ্রূণে এই রোগের সংক্রমণের হার প্রায় ১০০% এবং গর্ভকালীন সময়ে ঘটা এইচইভি-সংক্রমণ গর্ভপাত, মৃতসন্তান প্রসব এবং নবজাতকের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় (৭-১০)। সংস্পর্শে আসার সময় থেকে শুরু করে এইচইভি-র লক্ষণ প্রকাশের ব্যাপ্তিকাল ১৫ থেকে ৬০ দিন (গড় ৪০) (১১)। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে (প্রোডরমাল ফেজ) রোগীর জ্বর এবং বমি বমি ভাব হতে পারে। জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে (ইক্টেরিক ফেজ) চোখের সাদা অংশ বিবর্ণ হয়ে যায়, জন্ডিসের (চোখ এবং চামড়া হলুদ হয়ে যাওয়া) লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মুত্রের রং গাঢ় হয়ে যায়, ফলে মারাত্মক ভাইরাল হেপাটাইটিসের অন্যান্য কারণ থেকে এইচইভি-কে ক্লিনিক্যালি পৃথক করা যায় না (৪,১১)।

২০১২ সালে, গার্লি ও তাঁর সহকর্মীগণ বাংলাদেশে সম্পাদিত দুটি সমীক্ষার ভারবাল অটপসি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জন্ডিসের কারণে ঘটা মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা, অনুপাত এবং হার নির্ণয় করেন। সমীক্ষা দু'টি হলো: ২০০১ সালের বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা সমীক্ষা (বিএমএমএস ২০০১) এবং ২০০৩-২০০৫ সালের মতলব স্বাস্থ্য ও জনমিতিক সার্ভিল্যান্স। গর্ভকালীন সময়ে জন্ডিসজনিত মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত ২০০১ সালে ছিলো ১৯% এবং ২০০৩-২০০৫ সালে ছিলো ২৭%, এবং জন্ডিসের কারণে প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত ২০০১ সালে ছিলো ৫৪ জন এবং ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালে ৫৫ জন (৭)। আমাদের সমীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো সময় অতিক্রান্ত হওয়ার

সাথে সাথে মাতৃমৃত্যুর হারের ওপর জন্ডিসজনিত মৃত্যুর প্রভাবের কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ২০১০ সালে সম্পাদিত দ্বিতীয় বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা সমীক্ষা (বিএমএমএস ২০১০)-র উপাত্ত ব্যবহার করে পুনরায় এই বিশ্লেষণটি করা এবং বিএমএমএস-২০০১-এর সাথে তা তুলনা করার জন্য।

বিএমএমএস-২০১০ জাতীয়ভাবে প্রযোজ্য একটি সমীক্ষার মাধ্যমে ২০০৮-২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৭৫,০০০টি খানা থেকে মাতৃস্বাস্থ্য, মাতৃসেবা এবং মাতৃমৃত্যু-বিষয়ক ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, নির্বাচিত খানাসমূহে তথ্য সংগ্রহের দিন থেকে বিগত তিন বছরে কোনো মহিলা মারা গিয়েছিলো কি না তা জানতে চাওয়া হয় এবং সে-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অসুস্থতার সময় মহিলাদের রোগ-লক্ষণ ও উপসর্গ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিস্তারিত ভারবাল অটপসি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়।

জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা ও অনুপাত-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা ১৩ থেকে ৪৯ বছর-বয়সী মৃত্যুবরণকারী সব মহিলার (৯০১ জন) মৃত্যুর কারণসম্বলিত ভারবাল অটপসি তথ্য বিশ্লেষণ করি। গর্ভবতী অবস্থায় অথবা জীবিত বা মৃত সন্তান প্রসব কিংবা গর্ভপাত (ইচ্চাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত) ঘটার ৪২ দিনের মধ্যে একজন মহিলার মৃত্যুকে আমরা মাতৃমৃত্যু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি।

বিএমএমএস-২০১০ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত খানাসমূহে ১৩১টি মাতৃমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিলো (সারণি)। তাদের মধ্যে ৩০ (২৩%) জনের গর্ভকালীন সময়ে নতুনভাবে জন্ডিস রোগের সংক্রমণ ঘটেছিলো। জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (ওয়েটেড) ছিলো প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৪৫ জন। জন্ডিসজনিত ৩০টি মাতৃমৃত্যুর মধ্যে ১১টি (৩৭%) মৃত্যু ঢাকা বিভাগে এবং ২১টি (৭০%) গ্রামীণ এলাকায় ঘটে। উক্ত ৩০ জন মৃত মহিলার মধ্যে ১৮ জন (৬০%) জীবিত সন্তান এবং ৬ জন (২০%) মৃত সন্তান প্রসব করেন এবং ৩ জন (১০%)-এর গর্ভপাত ঘটে। মৃত মহিলাদের মধ্যে ৩ (১০%) জনের প্রসব-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় নি। যে ১৮ জন শিশু জীবিত জন্মগ্রহণ করেছিলো তারা জীবনের প্রথম এক মাস বেঁচে ছিলো কি না তা জানা যায় নি।

সারণি: বাংলাদেশে গর্ভকালীন জন্ডিসজনিত কারণে মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা, অনুপাত এবং হার

	বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা সমীক্ষা	
	২০০১[ক]	২০১০[খ]
মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা	১৮৬	১৩১
প্রতি ১০০,০০০ জীবিত সন্তান প্রসবে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত	৩২২	১৯৪
জন্ডিসজনিত কারণে মাতৃমৃত্যু		
সংখ্যা (%)	৩৫ (১৯)	৩০ (২৩)
প্রতি ১০০,০০০ জীবিত সন্তান প্রসবে	৬১	৪৫

[ক]গার্লি ও অন্যান্যদের নিবন্ধ (৭) এবং ২০০১ সালের বিএমএমএস সমীক্ষা (১২) থেকে প্রাপ্ত;
[খ]২০১০ সালের বিএমএমএস সমীক্ষা (১৩) থেকে প্রাপ্ত

২০০১ থেকে ২০১০ সালে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমেছে ৪০% এবং জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যু কমেছে ২৭% (সারণি)। উল্লিখিত বছরগুলোতে যদিও মাতৃমৃত্যু এবং জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমেছে, ২০০১-২০১০ সময়কালে গর্ভবতী মহিলাদের জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর আনুপাতিক ব্যবধানের গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি (১৯% থেকে ২৩%, পি-ভ্যালু=০.৩)। বিএমএমএস-২০১০ সমীক্ষায় জন্ডিসজনিত ৩০টি মাতৃমৃত্যুর মধ্যে ১২টি মৃত্যু গর্ভকালীন সময়ে রক্তক্ষরণের কারণে ঘটেছিলো বলে জানা যায় যা গর্ভকালীন সময়ে এইচইভিজনিত একটি সাধারণ জটিলতা (৬)।

প্রতিবেদক: সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, আইসিডিডিআর,বি; জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্রাক ইউনিভার্সিটি

অর্থানুকূল্য: সেন্টার ফর কমিউনিকেবল ডিজিজেজ, আইসিডিডিআর,বি

মন্তব্য

সংক্ষেপে বলা যায়, ২০১০ সালের মোট মাতৃমৃত্যুর ২৩% ছিলো জন্ডিসজনিত। ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলাদের জন্ডিসজনিত মৃত্যুর অনুপাত ছিলো একই রকম, এটি যে বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তা হলো: গর্ভকালীন সময়ের জন্ডিস মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও মোট মৃত্যুর মধ্যে কয়টি মৃত্যু এইচইভি-র কারণে হয়েছে তা অজানা রয়ে গেছে, একথা বলা যায় যে, গর্ভকালীন জন্ডিস মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পালন করছে।

ভারবাল অটপসি-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে যদিও ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন রোগীর রোগের ভিন্নতা নির্ণয় সম্ভব হতো, বাংলাদেশে অ্যাকিউট লিভার ফেইলিউর-এর ওপর ক্লিনিক্যাল সমীক্ষাগুলো থেকে জানা যায় যে, জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর জন্য দায়ী অনুঘটক গুলোর অন্যতম হলো এইচইভি (১৪-১৬)। বাংলাদেশে প্রতি বছর আনুমানিক ১২,০০০টি মাতৃমৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকে (১৭)। বিএমএমএস-২০১০ সমীক্ষার মাধ্যমে প্রজননক্ষম-বয়সী (১৩-৪৯ বছর) প্রায় ১৭৫,০০০ জন মহিলার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ২৩% মাতৃমৃত্যু জন্ডিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। সুতরাং, ২০১০ সালে বাংলাদেশে গর্ভকালীণ সময়ে ঘটা ২,৭৬০টি মৃত্যু জন্ডিসের সাথে সম্পর্কিত ছিলো। গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, এইচইভি-র প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন দেশসমূহে ৫০%-এর বেশি জন্ডিসজনিত মাতৃমৃত্যুর কারণ সম্ভবত এইচইভি।

গবেষণাটির বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। বহু নিম্নআয়ের দেশে যেখানে অধিকাংশ মহিলা বাড়িতে মারা যায় এবং মৃত্যুর জন্য কোনো সনদ প্রদান করা হয় না, সেখানে মাতৃমৃত্যুর হার এবং মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয়ের জন্য ভারবাল অটপসি তথ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (১৮,১৯)। ভারবাল অটপসি পদ্ধতি ব্যবহার করে গর্ভধারণজনিত কারণে ঘটা মৃত্যু নির্ণয় করা সহজ নয় (১৮) এবং আমাদের তথ্যের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো কারণ অতীতে মৃত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছর আগে মারা যাওয়া মহিলার শরীরে জন্ডিসের লক্ষণ ও উপসর্গ ছিলো কি না তা সনাক্ত করার জন্য উক্ত মহিলার আত্মীয় অথবা শুশ্রূষাকারীর দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আমাদের তথ্য এমন ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংগৃহীত হয়েছিলো যে, চিকিৎসাবিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণ নেই এমন একজন ব্যক্তি জন্ডিসের লক্ষণ—চোখ এবং ত্বকের রং হলদে হয়ে যাওয়া এবং মুত্রের রং গাঢ় হয়ে যাওয়া—সঠিকভাবে সনাক্ত করে তা মনে রাখতে পারবে এবং তথ্য সংগ্রহকারীকে তা জানাতে পারবে। রক্তে বিলিরুবিন-এর (পিত্তথলী থেকে নিঃসৃত হলদে পদার্থ) পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া

(হেপাটোসেলুলার জন্ডিস) মৃত্যু পূর্ববর্তী সময়ে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস (২০) এবং জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার একটি সাধারণ লক্ষণ, তবে এসব লক্ষণ থেকে এইচইভি-সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া যায় না। সুতরাং, জন্ডিসজনিত অধিকাংশ মাতৃমৃত্যু এইচইভি-র কারণে সংঘটিত হয়েছিলো এমন সিদ্ধান্তে আসার জন্য আমরা হাসপাতাল-ভিত্তিক সমীক্ষার প্রকাশিত নিবন্ধের ওপর নির্ভর করি (৭)।

এইচইভি-র কারণে কী পরিমাণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে তা জানার জন্য উদ্যোগ নেওয়া জরুরি কারণ টিকা প্রদানের মাধ্যমে এইচইভি-সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব (৫,৭)। এইচইভি প্রতিরোধের জন্য কার্যকর টিকা উদ্ভাবন করা হয়েছে কিন্তু উদ্ভাবিত টিকা গর্ভকালীণ সময়ে মহিলাদের সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম কি না তা বলার মতো প্রচুর পরিমাণ উপাত্ত আমাদের কাছে নেই। সুতরাং, মাতৃমৃত্যু এবং নবজাতকের মৃত্যু কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই টিকা কার্যকর কি না তা প্রমাণের জন্য একটি ইন্টারভেনশন ট্রায়াল জরুরিভাবে শুরু করা প্রয়োজন (২১,২২)।

References

1. Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases Manual. 19th ed. Washington: American Public Health Association; 2008.
2. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Outbreak of hepatitis E in a low income urban community in Bangladesh. *Health Sci Bul* 2009;7:14-20.
3. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Hepatitis E outbreak in Rajshahi City Corporation. *Health Sci Bul* 2010; 8:12-18.
4. Krawczynski K. Hepatitis E. *Hepatology* 1993;17(5):932-41.
5. Labrique AB, Sikder SS. Krain LJ, West KP, Christian P, Rashid M *et al*. Hepatitis E, a vaccine-preventable cause of maternal deaths. *Emerg Infect Dis* 2012;18(9):1401-4.
6. Kumar A, Beniwal B, Kar P, Sharma JB, Murthy NS. Hepatitis E in pregnancy. *Int J Gynecol Obstet* 2005;85(3):240-4.
7. Gurley ES, Halder AK, Streatfield PK, Sazzad HMS, Huda TMN, Hossain MJ *et al*. Estimating the burden of maternal and neonatal deaths associated with jaundice in Bangladesh: possible role of hepatitis E infection. *Am J Public Health* 2012;102(12):2248-54.
8. Hamid SS, Wasim JSM, Khan H, Shah H, Abbas Z, Fields H. Fulminant hepatic failure in pregnant women: acute fatty liver or acute viral hepatitis? *J Hepatol* 1996;25:20-7.
9. Hussain SH, Skidmore SJ, Richardson P, Sherratt LM, Cooper BT, O'Grady, JG. Severe hepatitis E infection during pregnancy. *J Viral Hepat* 1997;4: 51-4.
10. Patra S, Kumar A, Trivedi SS, Puri M, Sarin SK. Maternal and fetal outcomes in pregnant women with acute hepatitis E virus infection. *Ann Intern Med* 2007;147:28-33.
11. Centers for Disease Control and Prevention. Hepatitis E Information for

Health Professionals. Centers for Disease Control and Prevention. 2012 (http://www.cdc.gov/hepatitis/HEV/HEVfaq.htm#section2).

12. National Institute of Population Research and Training. Bangladesh Maternal Health Services and Maternal Mortality Survey 2001. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2003.
13. National Institute of Population Research and Training. Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey 2010. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2012.
14. Sheikh A, Sugitani M, Kinukawa N, Moriyama M, Arakawa Y, Komiyama K *et al*. Hepatitis E virus infection in fulminant hepatitis patients and an apparently healthy population in Bangladesh. *Am J Trop Hyg* 2002; 66(6):721-4.
15. Alam S, Azam G, Mustafa G, Azad AK, Haque I, Gani S *et al*. Natural course of fulminant hepatic failure: the scenario in Bangladesh and the differences from the west. *Saudi J Gastroenterol* 2009;15:229-33.
16. Mahtab MA, Rahman S, Khan M, Karim F. HEV infection as an aetiologic factor for acute hepatitis: experience from a tertiary hospital in Bangladesh. *J Health Popul Nutr* 2009;27:14-9.
17. Koblinsky M, Anwar I, Mridha MK, Chowdhury ME, Botlero R. Reducing maternal mortality and improving maternal health: Bangladesh and MDG 5. *J Health Popul Nutr* 2008;26(3):280-94.
18. Ronsmans C, Vanneste AM, Chakraborty J, Ginneken JV. A comparison of three verbal autopsy methods to ascertain levels and causes of maternal deaths in Matlab, Bangladesh. *Int J Epidemiol* 1998;27:660-6.
19. Misganaw A, Mariam DH, Araya T, Aneneh A. Validity of verbal autopsy method to determine causes of death among adults in the urban setting of Ethiopia. *BMC Med Res Methodol* 2012;12:130.
20. Marcovitch H. (editor). Black's Medical Dictionary, 41st ed. London: A & C Black Publishers Limited, 2005.
21. Shrestha MP, Scott RN, Joshi DM, Mammen MP, Thapa GB, Thapa N *et al*. Safety and efficacy of a recombinant hepatitis E vaccine. *Lancet* 2007;356(9):895-903.
22. Zhu FC, Zhang J, Zhang XF, Zhou C, Wang ZZ, Huang SJ *et al*. Efficacy and safety of recombinant hepatitis E vaccine in healthy adults: a large scale, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet* 2010;376(9744):895-902.

সার্ভিলেন্স আপডেট

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিটি সংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্য তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০১৩- ফেব্রুয়ারি ২০১৪

জীবণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* মোট=৬৪	*ভি. কলেরি ও১* মোট=২৬৭
মেসিলিনাম	৮৪.১	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৯.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	২৯.০	০.৮
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪৩.৮	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১.১
এজিথ্রোমাইসিন	৮৪.৪	১০০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০	পরীক্ষা করা হয় নি

তথ্যসূত্র: হাসপাতাল সার্ভিলেন্স, ঢাকা হাসপাতাল, আইসিডিডিআর,বি

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪

জীবাণুনাশক ওষুধ	মোট পরীক্ষিত	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১৫	৭ (৪৭)	০ (০)	৮ (৫৩)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১৫	১৩ (৮৭)	০ (০)	২ (১৩)
ক্লোরামফেনিকল	১৫	১৩ (৮৭)	০ (০)	২ (১৩)
সেফট্রিয়াক্সোন	১৫	১৫ (১০০)	০ (০)	০ (০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১৫	৫ (৩৩)	১০ (৬৭)	০ (০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	১৫	১ (৭)	০ (০)	১৪ (৯৩)

তথ্যসূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০১৩-ফেব্রুয়ারি ২০১৪

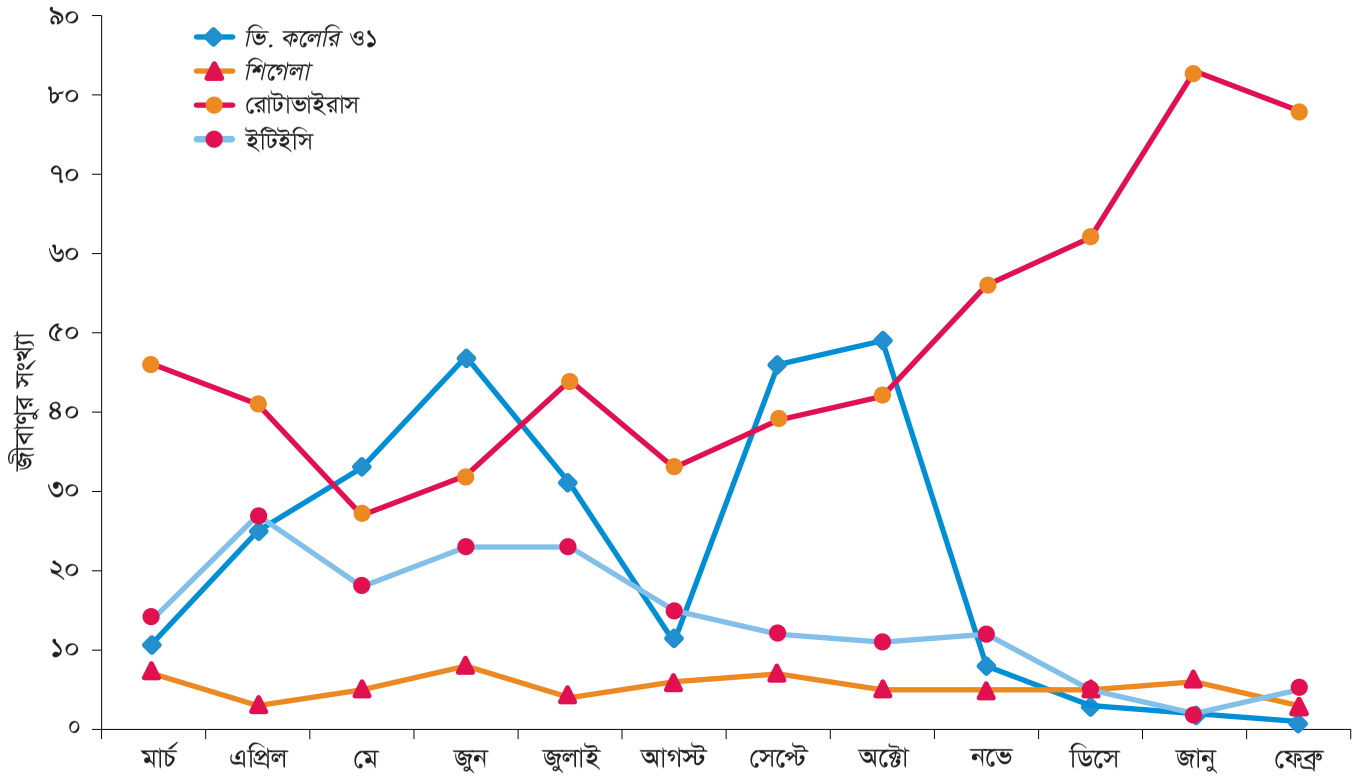

তথ্যসূত্র: হাসপাতাল সার্ভিলেন্স, ঢাকা হাসপাতাল, আইসিডিডিআর,বি

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: মার্চ ২০১১-ফেব্রুয়ারি ২০১৪

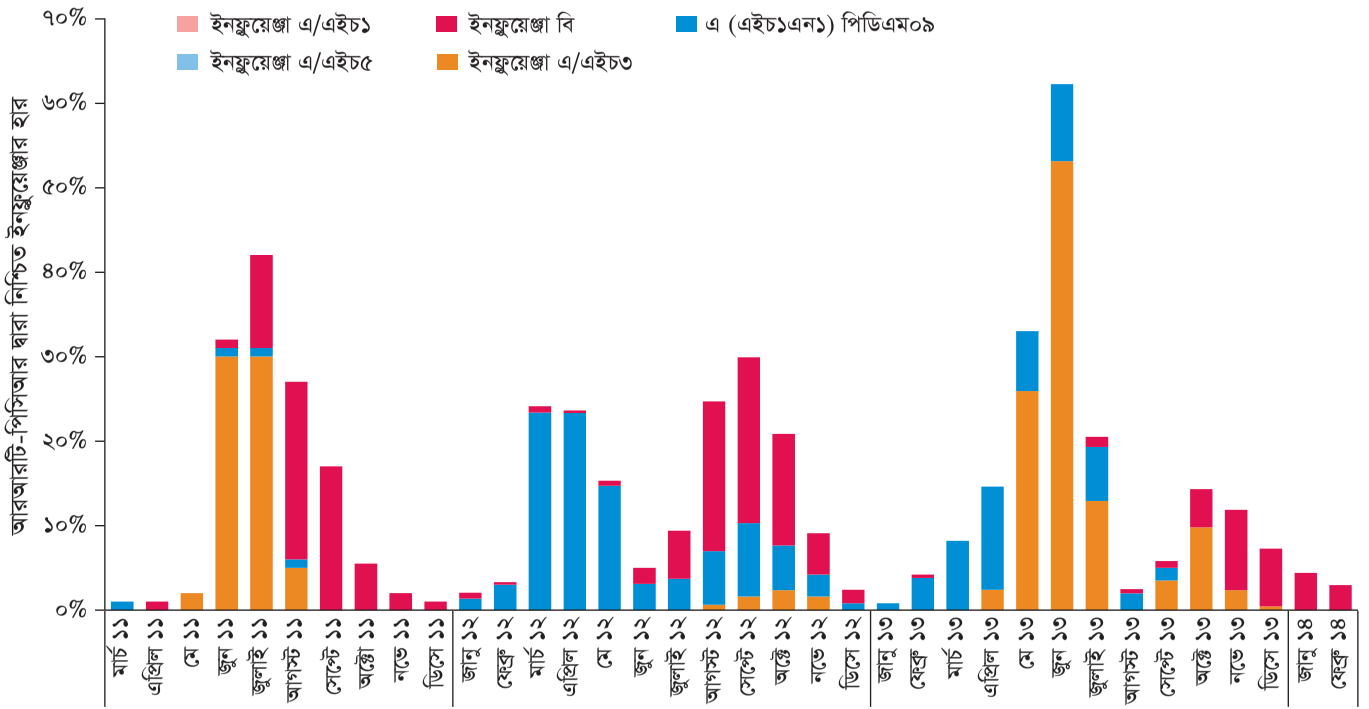

সূত্র: ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী হাসপাতালসমূহ: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

ঢাকা শহরের একটি ফার্মেসি থেকে ওষুধ বিক্রেতাগণ ক্রেতাদের সেবা দিচ্ছেন

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (অসএইড), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউকেএইড), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি
জেমস ডি হ্যাফেলফিংগার
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
এমিলি এস গারলি
ডায়ানা ডিয়াজগ্রানাডোজ

অতিথি সম্পাদক
সারলট ট্যামাসন

এ-সংখ্যায় যাঁদের নিবন্ধ ছাপা হলো
১ম নিবন্ধ:
সাইফুল ইসলাম
২য় নিবন্ধ:
ফাহমিদা চৌধুরী
৩য় নিবন্ধ:
রুপল শাহ

অনুবাদ, কপি সম্পাদনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে
দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস